Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 234-248

ছিটমহলের উপেক্ষিত মানুষ, তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত এবং শচীন দাশের আখ্যান

ড. মহম্মদ লতিফ হোসেন

বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ এবং তদ্‌জনিত উদ্বাস্তু জীবনচর্চা প্রতিফলিত হয়েছে যে সকল আখ্যানকারদের হাত ধরে, শচীন দাশ (১৯৫০-২০১৬) তাঁদের অন্যতম। উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ, মানচিত্র বদলে যায় কিংবা বর্ডার-এর মত টেক্সট্‌ আমাদের অনুধাবন করায়-যাপিত জীবনের যন্ত্রণার সংযুক্তিকরণ কীভাবে বৃহৎ আখ্যান প্রাচীর নির্মাণ করে। শচীন দাশের জন্ম ওপার বাংলায় নয়, এপারের উদ্বাস্তু কলোনিতে (বাঘাযতীন)। অথচ তাঁর জন্মস্থান হতে পারত ফরিদপুরের কোনও এক স্বচ্ছল আর্থিক-সামাজিক পরিবেশে, সুনিশ্চিত-স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়। কার্যত এই না হওয়াটাই সমকালের অসংখ্য দেশ হারাদের উত্তর প্রজন্মের মত শচীন দাশেরও দেশভাগ জনিত যন্ত্রণার সূত্রপাত ঘটায়। দেশ হারানোর ফলশ্রুতিতে সংঘটিত অভিশপ্ত বাস্তবই শচীন দাশের জীবন অভিজ্ঞতার মূলধন, আর তারই সার্থক বহিঃপ্রকাশ তাঁর সৃষ্টি, যে সৃষ্টির মধ্য থেকেই আমরা খুঁজে পাই লেখকসত্তার নিজস্ব এক মোনোলগ। জীবন অভিজ্ঞতায় স্পর্শ করতে পারেন বলেই পার্টিশন, সীমান্ত সমস্যা, সীমান্ত সংস্কৃতি – এসব কিছুই শচীন দাশের আখ্যানবৃত্তের ব্যক্তিগত বৈষয়িক উপাদান হয়ে উঠেছে। এই আত্মিকতা, সীমান্ত বিষয়ক ঔৎসুক্য থেকেই শচীন দাশের ছিটমহল বিষয়ক গল্পগুলি সৃষ্ট হয়েছে, এর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রান্তিক মানুষদের অসহায় জীবনযাত্রার প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি। ‘ছিটপাখি, ‘ছিটমানুষ, ‘ছিটমানুষের বেত্তান্ত, ‘ছিটমহলের ভূমি’– সমস্ত গল্পেই তাই একদিকে জটিল সীমান্ত সমস্যা, অন্যদিকে রাষ্ট্রহীন জীবনযাত্রায় বলিপ্রদত্ত অসহায় মানুষগুলির হাহাকার শুনতে পাই। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে বোঝা যাবে তাঁর অন্যান্য সীমান্ত বিষয়ক রচনার সাথে ছিটমহল বিষয়ক রচনাগুলির একটা পার্থক্য যেন অচিরেই তৈরি হয়ে গেছে। যাপিত জীবন, ফেলে আসা অতীত যেভাবে তাঁর সীমান্ত বিষয়ক গল্পগুলিতে কথা বলতে থাকে, চরিত্রদের স্বরে লেখকের স্বর মিশে গিয়ে যেভাবে গল্পগুলি হয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর, ছিটমহল বিষয়ক গল্পগুলিতে

....

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

আমরা তাঁর সেই কণ্ঠস্বরের অভাববোধ করি। এটা স্বীকার করতেই হয় যে ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল সমস্যা আন্তর্জাতিক হয়েও প্রবলভাবে আঞ্চলিক। কাজেই এই আঞ্চলিকতার মূল্যকে স্বীকৃতি না দিয়ে, কেবল দূর থেকে সমস্যাকে অনুধাবন করে সাহিত্য সৃষ্টি করা হলে তাতে কৃত্রিমতা আসবেই, এটা স্বাভাবিক। শচীন দাশের ছিটমহল বিষয়ক গল্পগুলি নির্দিষ্ট কিছু পরিচিত বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। আজকের গণমাধ্যম সর্বস্ব জীবনযাত্রায় ছিটমহল কারোরই অজানা নয়। একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে বোঝা যাবে ছিটমহলকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি মানবিক সমস্যাও সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছে। সেই রাষ্ট্রহীনতা, নকল পিতৃপরিচয়, দালাল বৃত্তি, সন্তান প্রসব জনিত নারীকেন্দ্রিক সমস্যা, আইডেন্‌টিটির ক্রাইসিস – এসব কিছুই আজ ছিটমহলকেন্দ্রিক অতি পরিচিত বিষয়। শচীন দাশের গল্পগুলি এই পরিচিত প্লটকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে। তবুও একে স্বীকার করেই বলতে হয় যে, সাহিত্যিক নীরবতার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও শচীন দাশের এই প্রয়াস ছিটবাসীদের জটিল সমস্যার স্বপক্ষেই যেন প্রতিবাদ হয়ে ওঠে। আখ্যানের বৃত্তে প্রতিটি চরিত্রই যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, জ্বলন্ত হয়ে ওঠে তাদের সমস্যা। নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তার দ্বন্দ্বে আক্রান্ত মানুষগুলির প্রতিটি চালচিত্রই যেন আমাদের পাঠকদের নতুনকরে ‘হ্যাঁ-দেশ—না-দেশ’-কে অনুধাবন করবার সুযোগ করে দেয়, বিষয়ের নতুনত্বের চাইতে উপস্থাপন রীতির কৌশল-ই গল্পগুলির মূল শক্তি। জটিল জীবনের অস্থিরতায় সম্পর্কের টানাপোড়েন, মেনে নেওয়া-মানিয়ে নেওয়ার তাগিদ, স্বীকৃতির প্রশ্ন ইত্যাদি বাস্তবে যা ঘটেছে সেটা যেমন পাঠকের কাছে কৌতূহলের, কী হতে পারত সেটাও আমাদের কাছে সম্যক কৌতূহল উদ্দীপক। শচীন দাশের ছিটমহল বিষয়ক গল্পগুলি আমাদের সামনে কিছুটা সেই ‘কী হতে পারত’-র সন্ধান দেয়। এও এক বিকল্প নির্মাণ।

‘ছিট মানুষের বেত্তান্ত’গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালের গল্পগুচ্ছ, শারদসংখ্যায়। পরবর্তী কালে গল্পটি কিছুটা পরিবর্তিত আকারে ‘কাঁটাতার’ নামে কালি ও কলম, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর গল্পটি সংকলিত হয় ২০১৬-র জানুয়ারি মাসে ‘যূথিকা বুক স্টল’ থেকে প্রকাশিত শচীন দাশের ‘পঁচিশটি গল্প’ সংকলনে। ২০১৮-য় গল্পটি পুনরায় সংকলিত হয় বরেন্দু মণ্ডল সম্পাদিত ছিটমহলের গল্প সংকলনে।

সমগ্র গল্পটিই মাত্র তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে দুজন পুরুষ, যারা ভারত ভূখণ্ডের এবং একজন ছিটমহলের অসহায় নারী। সীমান্ত

সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী নাজিবুল ও রহিমুদ্দির পারস্পরিক কথপোকথনে গল্পের সূত্রপাত হলেও মধ্যবিন্দুতে ছিটমহলের অসহায় নারী আম্বিয়ার রাষ্ট্রহীনতার কারণে সন্তান প্রসবজনিত পারিপার্শ্বিক যন্ত্রণা গল্পের মূল চালচিত্র হয়ে উঠেছে। তবে শুধুমাত্র এই পরিচিত বিষয়বস্তুর নিরিখেই গল্পটির সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এর বাইরেও অনেকগুলি প্রশ্ন, অনেকগুলি সংকটের চিহ্ন, বিভিন্ন সম্পর্কের মৃত্যু, সম্পর্কের অবিনির্মাণ – কাহিনির এগিয়ে চলায় ছিটবাসীদের বিচিত্র জীবনযাত্রা সম্পর্কে পাঠকদের কৌতূহলাক্রান্ত করে তোলে। প্রাথমিক পর্বে দাঁড়িয়ে নাজিবুল এবং রহিমুদ্দির আলাপচারিতায় একটা অপরাধ প্রবণতার ছাপ স্পষ্ট হয়, যা দেখে গল্পের শুরুতেই পাঠকের মনে হতে পারে গল্পটি হয়তো পিকারেস্ক শ্রেণির গদ্য। বিষয়টি আড়াল করবার কোনও জায়গা নেই যে- ছিটমহলের গল্পে অপরাধপ্রবণতা একটা বড়ো দিক। শুধু ছিটমহলই নয়, সীমান্তকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার আষ্ঠেপৃষ্ঠে যে অপরাধ প্রবণতার চাদর জড়িয়ে থাকে, যাকে আমরা সীমান্ত সংস্কৃতির (border related culture) কালো হাত বা ‘ডারটি হ্যান্ড’ বলতে পারি, সেই অপরাধ প্রবণতাই সীমান্ত কেন্দ্রিক শিল্প-সাহিত্য চর্চার একটি প্রথা বা ট্রেন্ড হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতেও হবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু যে দৃষ্টিতে আমরা Le Sage–র Gil Blas কিংবা স্মোলেটের Roderick Random -কে বিচার করি সেই দৃষ্টিতে আমরা শচীন দাশের ‘ছিট মানুষের বেত্তান্ত’-কে বিচার করতে পারি না। ‘পিকারো’ শ্রেণির তকমা এঁটে এই গল্পের নাজিবুল-রহিমুদ্দিদের ক্রিয়াকলাপকে কেবল অপরাধের দৃষ্টিতে দেখতে পারি না। অপরাধ প্রবণতার দিকটি এখানে প্রেক্ষিত ঘটনা নির্ভর, যাকে আমরা এপিসোডিক বলতে পারি, কিন্তু এই গল্পে কোনও উদ্ভটত্ব বা ফ্যান্টাসির চিহ্নমাত্র নেই। বরং একজন অপরাধীর মানবিকতায় উত্তরণের ছবিকে লেখক সযত্নে অঙ্কন করেছেন। দালাল রহিমুদ্দির হাত ধরে নাজিবুল ‘ডেলিভারি কেসের পার্টি’ হাতে পায়। কিন্তু মাত্র দু’হাজার টাকার বিনিময়ে সে ‘আইনত স্বামী’ বা ‘নকল স্বামী’ (legal husband বা fake husband) হতে চায় না। ছিটমহলকে কেন্দ্র করে এই ধরনের মাফিয়ারাজ কিংবা ছিটবাসীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অমানবিক দর কষাকষির চিত্র সাবলীল। কিন্তু নাজিবুলের গল্প আমাদের অন্য কথা শোনায়।স্বামী নিখোঁজ হয়ে যাওয়া আম্বিয়ার দুর্দশা নাজিবুলকে মানবিক করে তোলে। কিন্তু আখ্যানকার যখন বলেন –

সে জানে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ওই ছিটমহলে কোনো হাসপাতাল নেই। শুধু হাসপাতাল কেন, নেই কোনো হেল্‌থ সেন্টারও। এছাড়া স্কুল নেই, কলেজ নেই। পড়তে হলে আসতে হবে ওদেরই এই গ্রামের স্কুলে। আর তাও কী, পরিচয় বদলে ঠিকানা পালটে। স্কুলের

খাতায় নাম উঠবে তখন অন্য কোনো বাপের সন্তান হিসেবে। যে বাবারা নাজিবুলের মতো ইন্ডিয়ার ভোটার। ইন্ডিয়ার নাগরিক। এবং সেখানেই থাকে। সেখানেই বসবাস করে। অথচ ওরা? ছিটের ওই মানুষগুলো! ওদের কোনো পরিচয় নেই। ওদের কোনো দেশ নেই।[১]

নাজিবুলের জানার পরিসরকে মাধ্যম করে কথাকার যখন এই বক্তব্য তুলে ধরেন, তখন মনে হয় তিনি যেন আখ্যান বৃত্তের বাইরে থেকে ছিটমহলের নানান সমস্যার ইস্তাহারকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চান। লেখক যেহেতু স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট কোনও ছিটমহলের নাম উল্লেখ করেননি তাই ছিটমহলের অবস্থান সংক্রান্ত প্রশ্নটিও উঠে আসা স্বাভাবিক। বিশেষ করে তিনি যখন কাঁটাতারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, এমনকি গল্পের পরিবর্তিত রূপের নামকরণও করেন 'কাঁটাতার'তখন গল্পের পটভূমি কোন অঞ্চলে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্নও আমাদেরকে ভাবায়। বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ছিট নাকি ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশি ছিট –এ দ্বন্দ্ব আমাদের মনে সক্রিয় থাকে। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ছিটবাসীদের ভারতে প্রবেশের কোনও সুযোগ থাকত না। প্রয়োজনে অবৈধ উপায়ে তারা বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সাথে যোগাযোগ রাখত, বাংলাদেশি পরিসেবার সুযোগ নিত, ভারতের নয়। সুতরাং আমাদের ধরে নিতে হবে গল্পের আম্বিয়া ভারত ভূখণ্ডে অবস্থিত বাংলাদেশি ছিটের অধিবাসী। কিন্তু এখানে কাঁটাতারের প্রসঙ্গ এসে যাওয়ায় মূল বিতর্কের সূত্রপাতটি দেখা দেয়। ছিটমহলকে ঘিরে কোনও কাঁটাতার নেই, বরং আছে এক অদৃশ্য প্রাচীর। সেই প্রাচীর যতটা রাষ্ট্রনৈতিক, তার চাইতে অনেক বেশি সামাজিক। ছোটো ছোটো পিলার আর তাতে খোদাই করা জে. এল. নম্বর ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহলের সীমানা সূচকের কাজ করলেও, মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দারা ছিটবাসীদের সামাজিক দিক থেকে বয়কট করে রাখত, তাদের একঘরে করে রাখত। এমনকি ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানা যায় ছিট বিনিময়ের পর এই পরিস্থিতি কোথাও কোথাও এখনো বজায় আছে। এই অপমানকর বাঁচায়, সীমান্তরক্ষীদের অত্যাচার কিংবা অনুপ্রবেশকারীর তকমায় ক্রমশ বিচ্ছিন্ন (আইসোলেট) হয়ে যাওয়া এই মানুষদেরই একজন আম্বিয়া।অবস্থানগত গোলমেলে চিত্র শেষঅবধি গল্পের আস্বাদনে বাঁধা হয়ে ওঠে না যখন আম্বিয়াদের জীবনযাপনের আলেখ্য ছিটবাসীদের সংকটকে জীবন্ত করে তোলে।এখান থেকেই আখ্যানকারের বয়ান বাস্তবের চিহ্নগুলিকে প্রকট করে তোলে। আখ্যানকার যখন বলেন–

কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়ে যখন ওই অখণ্ড দেশটা ভাগাভাগি করে দিল ইংরেজরা তখন থেকেই

এই জায়গাগুলোর আর কোনো ব্যবস্থা হয়নি। শিক্ষার পাঠ তাই লুকিয়েচুরিয়ে চলে এখানে। গোপনে বিএসএফ-এর সঙ্গে লুকোচুরি চলে। আবার বাচ্চাও জন্ম নেয় বুঝি এভাবে। অন্যের পরিচয়ে। টাকার বিনিময়ে। এতে অবশ্য নাজিবুলের মতো ছেলেছোকরারা করেকম্মে খাচ্ছে। যা পায় বর্ডারে দিয়ে হাসপাতালে লাগিয়েও মন্দ থাকে না।[২]

শুধু ছিটমহলই নয়, নাজিবুলদের মত প্রান্তিক মানুষদের ক্রাইসিসগুলিও এখানে মোটা দাগে চিহ্নিত হয়। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর গভীর ফাঁকগুলিকেও লেখক যেন আলোকিত করতে চেয়েছেন। রহিমুদ্দির হাত ধরে গর্ভবতী আম্বিয়ার ভারত ভূখণ্ডে আসা এবং নাজিবুলের পরিচয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার চিত্রে দালাল চক্রের নিখুঁত ব্যবস্থাপনার সন্ধান মেলে। বিশেষভাবে হাসপাতালের সরকারি কর্মীদের সাথে দালাল চক্রের গোপন মেলবন্ধন প্রকট বাস্তবকেই সামনে আনে। অসহায় আম্বিয়ার সৌন্দর্য নাজিবুলের মানসিকতায় যে পরিবর্তন আনে, সেটা ভালোলাগার। এই ভালোলাগাকে ‘দেহ কেন্দ্রিক’(এরোটিক) নাকি ‘মন কেন্দ্রিক’(প্লেটোনিক) বলব তা বিচার করবার কোনও পরিসর আমরা পাইনা। কিন্তু নাজিবুলের দৃষ্টিতে উঠে আসা আম্বিয়ার ব্যাগে যত্নশীল হাতের স্পর্শে সজ্জিত অন্তর্বাসের উল্লেখে লেখক যেন নাজিবুল এবং আম্বিয়ার আগামী সম্পর্কের গৌরচন্দ্রিকাকেই উপস্থাপন করেছেন। একে আমরা প্রেমের উদ্দীপন বিভাব বলতেই পারি। ছিটমহল কেন্দ্রিক ট্রাজেডির অভ্যন্তরে হঠাৎ করে জেগে ওঠা এই রোমান্টিসিজম্ মানবিক কামনা-বাসনার চাইতে সম্পর্কের টানাপোড়েনগুলিকেই দৃঢ় করে। আম্বিয়ার চোখের জলের উৎস তার মনস্তত্ত্বের কোন দিককে ফুটিয়ে তোলে তা আমরা অনুধাবন করতে পারিনা। স্বামীর নিখোঁজ হওয়া নাকি নকল স্বামীর পরিচয়ে আশ্রয় গ্রহণ –কী তার বিষাদের কারণ তা স্পষ্ট হয় না। পুত্র সন্তান জন্মদানের পর আম্বিয়া যখন জানতে পারে তার ভাইয়েরা তার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছে, তখন নকল সম্পর্কের পথেই আম্বিয়াকে তার আগামীর অস্তিত্বের খোঁজ করতে হয়। নিঃসঙ্গ নাজিবুলও এই পেশাদারি সম্পর্কের ঘেরাটোপকে অতিক্রম করে নতুন করে ঘর বাঁধতে উদ্যোগী হয়। রাষ্ট্রহীন অসহায় নারী পেয়ে যায় নাগরিকত্ব, দেশহীন শিশু পায় বৈধ পিতৃ পরিচয়।

গল্পে আম্বিয়ার স্বামী ফজজুলের নিখোঁজ হবার যে সম্ভাব্য কারণগুলি কথাকার নাজিবুলের ভাবনায় তুলে ধরেছেন, তা ছিটবাসীর অনিশ্চিত, নিরাপত্তাহীন জীবনযাপনের ছবিকেই তুলে ধরে–

> এমন সুন্দরী ও রূপসী বউ ফেলে সে কেন পালাল? পালাল না অন্যকিছু!...নাকি

বর্ডারে কোনো স্মাগলিং-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। পরে বি.এস.এফ.-এর গুলিতে মরে গিয়েছে। কিন্তু কোন আন্ধারে বডি পড়েছে তার খোঁজ আর কেউ জানে না।[৩]

স্মাগলিং, বি.এস.এফ.-এর গুলিতে মৃত্যু যে কোনও সীমান্তের মত ছিটমহলেও সাবলীল ভাবে ঘটে থাকে। প্রায়শই দেখা যায় ছিটমহলবাসীরা কাজের সূত্রে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে পুলিশ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে তাদের গ্রেপ্তার করত।তারপর পুশব্যাক করা হত বাংলাদেশে। কোনও দেশের পরিচয়পত্র না থাকায় ভারত-বাংলাদেশ কোনও দেশের আদালতেই তাদের মামলা নেওয়া হত না, পাওয়া যেত না কোনও আইনজীবী। এদেশ-ওদেশের জেলেতে বন্দি থেকেই জীবন কাটাতে হত অধিকাংশ ধৃত ছিটবাসীকে। আবার কখনো বর্ডার অঞ্চলে এনে তাদের ছেড়ে দেওয়া হত। ‘নিউজ টাইম’-এর উদ্যোগে নির্মিত ‘ব্রাত্যজনের দেশে’ নামক একটি তথ্যচিত্রে কোচবিহার ‘রেডক্রসে’র অন্যতম সদস্য স্বপন আচার্য ভাদুড়ি জানান–

আগে পুশব্যাক হত, পুশব্যাকে লাইফ গ্যারান্টি ছিল না। পুশব্যাকে কাকে ছাড়া হচ্ছে, কাকে মেরে ফেলা হচ্ছে কোনও খবরাখবর ছিল না। নিয়ে এসে বর্ডার এরিয়াতে ছেড়ে দেওয়া হত এবং সে আদৌ বাড়ি ফিরে যাচ্ছে কিনা সেটাও ঠিক ছিল না।[৪]

গল্পে নাজিবুলদের হয়ে ওঠার দিকটিকেও লেখক তুলে ধরেছেন। তিনি যদিও এদের ‘দালাল’ বলেন নি, তবে ছিটমহল গুলিতে এ জাতীয় ‘ভাড়াটে স্বামী’ বা ‘ভাড়াটে পিতা’-দের ‘দালাল’ নামেই অভিহিত করা হয়। কথাকার যখন বলেন–

চেহারাটা ছিল সুন্দর। কন্দর্পকান্তি। অতঃপর এদিকে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে এই লাইনে নেমে পড়া। বছর পঁচিশের নাজিবুল তাই ফেরেনি আর কোথাও। নানান ধান্দায় জীবন কাটিয়েছে। কখনও চেকপোস্টে টুরিস্টদের ব্যাগ টানা, কখনও বা ছিটের পোয়াতিদের ভাড়াটে স্বামী খাটা। তাও কী হত নাকি! সেবার ভোটের সময়েই ভোটার কার্ডটা হয়ে গেল। এখন এই কার্ডটাই তার মস্ত ভরসা। ভোটের সময় যে পার্টি টাকা দেয় তার হয়েই খাটে। আবার ভোট ফুরোলে এটা-সেটা-ওটা। এভাবেই তো প্রায় আটদশটা পোয়াতির স্বামী হল সে।[৫]

এভাবেই ছিটমহল সংলগ্ন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ছেলেরা কম সময়ে বেশি পরিমাণে অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে অবৈধ পথে রোজগারের পথ বেছে নেয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিবেশ এর একটি বড়ো দিক হলেও, অনেক সময় দেখা যায় তাদের যথেষ্ট সম্পদ কিংবা চাষযোগ্য জমি থাকা সত্ত্বেও বেশি পরিমাণে নগদ অর্থ হাতে পাবার লোভে এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপে জড়িয়ে পড়ে।

গল্পের নাজিবুল অবৈধ পথে উপার্জন করলেও সে দুশ্চরিত্র নয়। অবস্থা বিশেষে সে মানবিক। তাকে ঠিক অপরাধী বা দুস্কৃতি বলা চলে না। অসহায় আম্বিয়ার

তার জীবনে আকস্মিক। ড্যানিয়েল ডিফোর Moll Flanders–এর পাত্র-পাত্রীদের মত এখানেও এক বিশেষ পারিবারিক এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে নাজিবুলদের ঘটনাচক্রে দুষ্কৃতিকারীর জীবনে এসে পড়তে হয়। শেষ পর্বে আমরা লক্ষ করি, যে আম্বিয়া কোনও দিন ছিটমহলের বাইরে আসেনি, কিন্তু শেষ অবধি তাকে ছিটের বাইরে চলে আসতে হয়। হয়তো ফিরে যেতে পারবে না কোনও দিন। কিন্তু এজন্য তার দুঃখ নেই। ভারত ভূখণ্ডের নাজিবুলকে আঁকড়ে ধরেই সে বাঁচতে চায়। এভাবেই ছিটমহল তার জটিল ভূমিগত অবস্থানের মতই পাত্র-পাত্রীর সম্পর্কগুলিকেও যেন জটিল করে তোলে। সেখানে আত্মিক সম্পর্কের চাইতেও দেশ লাভের আকাঙ্ক্ষা, কিংবা নাগরিকত্ব অর্জনের তাগিদটিই যেন বড়ো হয়ে ওঠে।

'ছিটমানুষ' গল্পটি প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালের পরিচয় শারদ সংখ্যায়। এরপর তা সংকলিত হয় ২০১৬-র জানুয়ারি মাসে 'যূথিকা বুক স্টল' থেকে প্রকাশিত শচীন দাশের পঁচিশটি গল্প–এ। গল্পটির সূচনা ঘটেছে অন্ধকার রাতের বর্ণনায় এবং অদ্ভুতভাবে গল্পটির সমাপ্তিও ঘটেছে অন্ধকারের চিত্রকল্প দিয়েই।কাজেই এই অন্ধকারের প্রতীকি ব্যবহারে আমারা পাঠকেরা অনুধাবন করতেই পারি –এ আসলে ছিটবাসীদের জায়মান জীবনযাত্রার সংশয়াত্বক দিককেই চিহ্নিত করে।গল্পটির ঘটনাক্রম গভীর রাত থেকে আরম্ভ হয়ে পরদিন সন্ধ্যা অবধি। এ সময়ের মধ্যেই মিলন-বিচ্ছেদের পারস্পরিক দোলাচলতা গল্পের পাত্র-পাত্রীদের জীবনের চড়াই-উৎরাই-কে সূচিত করে। গল্পের মূল চরিত্র ষাটোর্ধ্ব আবু তাহের এবং তার নিঃসঙ্গ জীবনযাপন গল্পের একটি প্রধান দিক। তার এই নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের মূলেও রয়েছে ছিট। বৃদ্ধ আবু তাহের তাই ছিটমানুষ, আর এখানেই আবু তাহেরের বিচ্ছিন্ন জীবন বৃত্তান্তের সাথে ছিট বৃত্তান্তের অনুষঙ্গটিও চমৎকার ভাবে মিলে যায়। স্ত্রী রহিমার মৃত্যু এবং কন্যা শাকিলা ও আমিনার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আবু তাহেরের জীবন ঘিরে একাকিত্বের পরিসর তৈরি হয় –এটুকু যে কোনও পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা হতেই পারে। কিন্তু যখনই পুত্র জসীমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখনই ছিটমহলের জটিল জীবনযাত্রা এবং জটিল সম্পর্কের চালচিত্র আখ্যান বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে গল্পটি হয়তো ছিটমহল কেন্দ্রিক অতি পরিচিত পিতৃপরিচয়ের যে দ্বন্দ্ব, তার সাপেক্ষেই রচিত হয়েছে। এ ধরনের সংকট কাহিনিতে পরিলক্ষিত হলেও,গল্পটি কেবল পরিচিত প্লটের সরলীকৃত রূপ হয়েই থাকে

না, হয়ে ওঠে আত্মপরিচয়ের সংকটে বিধ্বস্ত মানুষের আখ্যান, যা সিন্থেসিসের পর্যায়ে উন্নীত হয়।

ছিটমহলের অসম জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ে অভিযোজিত আবু তাহের পুত্র জসীমকে অনিশ্চিত জীবনযাত্রার অন্ধকার পথে ঠেলে দিতে পারেনি। তাই মিথ্যে পরিচয়ের আশ্রয়ে ছেলেকে তুলে দিতেও দ্বিধাবোধ করে নি। দেলোয়ার হোসেনের মিথ্যে পিতৃপরিচয় তার পুত্রের বাঁচবার অবলম্বন হলেও, জীবন সন্ধ্যায় পৌঁছে সেই মিথ্যেই বৃদ্ধ আবু তাহেরকে তার অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সরকারি চাকুরি, স্ত্রী-পুত্র, ভারত ভূখণ্ডে নিজেস্ব গৃহ– সব মিলিয়ে মিথ্যে ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় জসীমের জীবন। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ব্যবধানে ছিটমহলে ফিরে জসীম যখন পিতার মুখোমুখি হয়, নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত বুড়ো তার অতীতকে ফিরে দেখতে চায়। কথাকার তাহেরের এই ভাবনার সূত্র ধরেই ছিটসমস্যার ঘূর্ণাবর্তে পাঠককে প্রবেশ করাতে চেয়েছেন। জসীম পিতাকে শোনায় তার আশ্রয়দাতা পিতা দেলোয়ার হোসেনের মৃত্যু সংবাদ। একজন পিতা হয়ে পুত্রের মুখে তার আরেক পিতার মৃত্যু সংবাদ শোনা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও আবুদের মত ছিটমানুষদের কাছে তা সাবলীল বলেই মনে হয়। জসীম আবুকে নিয়ে যেতে চায় নিজের কাছে, ভারত ভূখণ্ডের বাড়িতে। এরপর গল্পের হঠাৎ বাঁক বদল ছিটবাসীদের ভবিতব্যে নিহিত সত্য-মিথ্যের দ্বন্দ্বগুলিকে যেন আরও প্রকট করে তোলে। আবু তাহেরের দেশ, পরিচয়, পরিবারের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে যায়, যখন সে অনুধাবন করে মৃত দেলোয়ারের পরিচয়পত্রেই তাকে বৈধ দেশের ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে হবে –

জসীম জানাল এখন এইডাই হইল আপনের রক্ষাকবচ! ঠিকানাটা মনে কইর‍্যা রাইখেন। চেকপোস্টে কামে লাগব। আপনেরে জিগাইতে পারে –

কিন্তু দেলোয়ার হোসেন তো গোরে গেছে গিয়া –

যাউক না। হেইতে আপনার কী! গোর থিক্যা উইঠ্যা, অহনের আবার আপনের শরীরে ঢুইক্যা পড়ব। চাপা একটা হাসিতে বুঝি আবুর দিকে চোখও তুলেছিল জসীম। আবু চমকে উঠল।

কী কস? আবূ বিস্মিত।[৬]

এখানে আবু তাহেরের বিস্ময়, রাগ, ক্ষোভ আমাদেরকেও কতগুলি প্রশ্নের সামনাসামনি দাঁড় করায়। বিশেষ করে লেখক যখন আবুর কণ্ঠে উচ্চারণ করেন – 'আবারও সেই দেলোয়ার হোসেন?' তখন আমাদেরও জানতে ইচ্ছে করে আবু তাহেরের এই ক্ষোভ মৃত ব্যক্তির পরিচয়ে আশ্রয় নেবার কারণে, নাকি তার মধ্যেও

সক্রিয় থাকে কোনও ইগোর লড়াই। বাস্তবে ছিটমহলের অসহায় পিতারা কীভাবে গ্রহণ করেন তাদের সন্তানের 'লিগ্যাল ফাদার'-দের–এই প্রশ্ন আমাদের পাঠকদেরকেও কৌতূহলী করে তোলে। ছিটমহল বিষয়ক তথ্যচিত্র 'ব্রাত্যজনের দেশ'-এ ছিটের এক অভিভাবক কেবলা মিয়াঁ জানাচ্ছেন–

'আমার ছেলের পড়াশুনোর জন্য আমাকে মিথ্যে বলতে হয়। বিশেষ করে আমাদের দুঃখ এই যে আমাদের ছেলেদের সুবিধের জন্য ছিটের সব বাবা-মাকেই এভাবে মিথ্যে বলতে হয়।'[৭]

গল্পের আবু তাহেরকেও এভাবেই একদিন ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেলোয়ার হোসেনেরমিথ্যে পরিচয়ের আশ্রয়কে গ্রহণ করতে হয়েছিল। নিজ হাতে আপন পিতৃত্বকে তার তুলে দিতে হয়েছিল দেলোয়ারের হাতে। দেলোয়ারের মৃত্যুর পরেও যখন পুনরায় দেলোয়ারেরই মিথ্যে পরিচয়ের আশ্রয়ে বেঁচে থাকবার প্রশ্নটি আবু তাহেরের সামনে উঠে আসে, তখন আবু সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেনি। পুত্রকে জানায় – 'কুনোদিন যদি সত্য পরিচয়ে লইয়্যা যাইতে পারস তো আইস!'[৮] পিতার এই অভিমান পুত্র জসীমকেও গভীর কোনও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। পিতার কাছে সেও জানতে চায় – 'তয় আমারে পাঠাইছিলেন ক্যান? ক্যান কন তো! সারাটা জীবন আমিও তো মিথ্যা পরিচয়েই কাটাইয়্যা দিলাম। ক্যান কাটাইলাম-'[৯] বাস্তবে এই প্রশ্ন প্রতিটি ছিটবাসীকেই আক্রান্ত করবে এটা স্বাভাবিক। ব্যবহারিক সম্পর্কের সাথে আত্মিক সম্পর্কের যোগসূত্রকে তারা কখনোই অন্বেষণ করতে পারবে না। ছিটমহল বিনিময় পরবর্তী কালেও হয়তো এ সংশয় ছিটবাসীদের পিছু ছাড়বে না।

৩ আগস্ট, ২০১৫-য় এই সময়–এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে আমরা এই জাতীয় সমস্যাকেই উঠে আসতে দেখি –'পিতৃ পরিচয় ভুলে থাকতে কারই বা ভালো লাগে?' শীর্ষক শিরনামে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে পোয়াতুরকুঠি ছিটের প্লাবন চক্রবর্তীর ভাষ্যকে আমরা খুঁজে পাই। প্লাবন চক্রবর্তী ছিটের অধিবাসী হয়েও মিথ্যে পরিচয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং তিনি বর্তমানে মুম্বইয়ে একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থায় কর্মরত। তাঁর বক্তব্য হল–

এখানকার আরও কয়েক হাজার মানুষের মতো আমারও বড় হয়ে ওঠা সম্পূর্ণ মিথ্যা পরিচয়েই। এখানকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতিভা, মেধার অভাব নেই। অনেকেই এত কষ্টের মধ্যে স্নাতক, স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত পড়াশোনাটাও করেছেন। যেমন, আমি নিজেই। আমার হয়তো কপালটাও ভালো। তাই প্রথমে আইটিআই, পড়ে দিল্লি থেকে ডিপ্লোমা কোর্স করে

আমি এখন মুম্বাইতে কাজ করছি। বিদেশেও চাকরির একটা সুযোগ এসেছে। কিন্তু এখন এই স্বাধীনতার আনন্দের মুহূর্তেও আমি নিজের ছবি প্রকাশ করতে চাইছি না। কারণটা জানেন। আমি সেই মিথ্যে পরিচয়েই পাসপোর্টের আবেদন করেছি। ক'দিনের মধ্যেই পুলিশ ভেরিফিকেশনও হবে। গোটা বিশ্ব হয়তো জানে, ৩১ জুলাই রাত ১১টা ৫৯ মিনিটের পর থেকে ছিটমহলের বাসিন্দারাও স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েছি। আমাদের নতুন করে বৈধ পরিচয়পত্রও হবে। আমার ঠিকানা, বাবা-মার নাম সবই বদলে যাবে। বদলাতে হবেও। কে-ইবা মিথ্যা পরিচয়ে বাঁচতে চায় বলুন না ? তবু এখনও মনের মধ্যে শঙ্কা থেকে যাচ্ছে। এখন যদি নিজের যাবতীয় পরিচয় বদলে ফেলি, তা হলে পুলিশ ভেরিফিকেশনে সমস্যা হবে না তো? তাঁরা কি এতটা মানবিক ভাবে বিষয়টা বুঝবেন?...তাই কঠিন বাস্তবের কথা মাথায় রেখে আবেগে ভেসে যেতে পারছিনা। ...সবচেয়ে বড় কথা, আমার মতো যারা মিথ্যা পরিচয়েই স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছি, এখন আসল পরিচয় পেতে সেই ছন্দ হারিয়ে যাবে না তো?[১০]

সংকটের মাত্রাটিকে স্পর্শ করতে হলে বৃহৎ এই প্রতিবেদনটির উল্লেখ না করে উপায় ছিল না। একদিন মিথ্যে পরিচয়েই ছিটবাসীরা যেভাবে জীবনের ছন্দে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছিল, নতুন পরিচয়ে ফিরতে তাদের সেই ছন্দ যে হারাবে না, সে সম্পর্কে আমরাও নিঃসংশয় হতে পারিনা। গল্পের জসীমের সত্য-মিথ্যের যে দ্বন্দ্ব, তা বাস্তবের জসীমদেরও এই গভীর দ্বন্দ্বের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

'ছিটপাখি'গল্পটি প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালের নন্দন শারদ সংখ্যায় এবং গল্পটি সংকলিত হয় ২০১৬-য় 'যূথিকা বুক স্টল' থেকে প্রকাশিত শচীন দাশের পঁচিশটি গল্প নামক গল্প সংকলনে। 'ছিট মানুষের বেত্তান্ত'-র মত এই গল্পেও প্রসূতি নারীর সন্তান জন্ম দেবার বিষয়কে কেন্দ্র করে অসহায় ছিট নারীর ইতিবৃত্তকে তুলে ধরা হয়েছে। তবে গল্পটির উপস্থাপন রীতি ভিন্ন। গল্পের নায়িকা রাবেয়ার সঙ্গে আমরা কখনোই 'ছিটমানুষের বেত্তান্ত'গল্পের নায়িকা আম্বিয়াকে মেলাতে পারিনা। কার্যত এই গল্পের ভেতর থেকে আমরা একরকম প্রতিবাদের স্বরকে উচ্চারিত হতে দেখি। রাবেয়া হয়ে ওঠে সেই প্রতিবাদের মুখ। 'নেই রাষ্ট্রে'র বুকে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার যাবতীয় প্রতিবাদ। মিথ্যে পরিচয়ের শৃঙ্খলকে রাবেয়া তাই গ্রহণ করতে পারেনা, পরিবর্তে ছিটনারী হয়েও মৃত্যু বরণ করতে সে দ্বিধাবোধ করে না।

আমরা জানি, কোনও কাজ করবার স্বাধীনতা থাকা বা না-থাকার সূত্রে অধিকার শব্দটি উদ্ভূত হয়। শব্দটির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণীত হয়। বস্তুত অধিকার রাষ্ট্রের সদর্থক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। অধিকার প্রদানের মাধ্যমে

মানব-কল্যাণ সাধিত হয়।[১১] ছিটবাসীদের সঙ্গে স্বাধীনতা না-থাকার সূত্রে ‘অধিকার’শব্দটির প্রয়োগ ঘটে এমনটা নয়, বরং এর সাথে যুক্ত থাকে রাষ্ট্রহীনতার সম্পর্ক। কাজেই ‘অধিকার’-এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষ ও রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক নির্ণীত হয়, ছিটমহলে রাষ্ট্র না থাকায় সেই সম্পর্কটি এখানে খণ্ডিত হয়। আম্বিয়া, রাবেয়াদের তাই অবৈধ উপায়ে সেই অধিকারকে পাবার জন্য লড়াই করতে হয়। ‘ছিটমানুষের বেত্তান্ত’গল্পের নায়িকা আম্বিয়া এই অবৈধ উপায়কে মেনে নিয়ে নতুন করে গড়ে ওঠা সম্পর্কের হাত ধরে রাষ্ট্রের বুকে আশ্রয় নিতে দ্বিধা বোধ না করলেও, এই গল্পের রাবেয়া কিন্তু এই কৃত্রিম সম্পর্কের নাগপাশে নিজেকে আবদ্ধ করতে পারে নি। ভাড়াটে স্বামীর মিথ্যে পরিচয়ে সন্তান জন্ম দেবার লাঞ্ছনা ছিটনারীদের যে ভবিতব্য, রাবেয়া এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে- ‘পরপুরুষের জন্মটিকা লইয়্যা বাচ্চা বিয়াইবা, লজ্জা করে না তোমাগো ?’[১২] ছিটমহলের পরাধীনতা সম্পর্কে সচেতন রাবেয়ার স্পষ্ট প্রতিবাদ–

আমি যদি এই ছিটমহলেই দাইয়ের হাতে হইতে পারি তয় আমার বাচ্চাও এইহানে হইতে পারব! জন্ম লইয়্যা হেয় জানুক হের কোনো স্বাধীনতা নাই।[১৩]

রাবেয়ার ব্যক্তিগত স্বর এখানে যেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বঞ্চিত মানুষগুলির নৈর্ব্যক্তিক স্বরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নীরব নারীর অতর্কিত অন্তর্ঘাত যেন তথাকথিত মানবাধিকারের বাহ্যিক মুখকে লজ্জায় ঢেকে দেয়।

এই গল্পেও আমরা ইমানুল, বশিরদের মত মানুষদের খুঁজে পাই, যারা অর্থের বিনিময়ে সম্পর্ককে পণ্য করে তোলে। গল্পে ইমানুলের দ্বৈত নামের ব্যবহারে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট না হলেও বোঝা যায় ইমানুলেরা আসলে দালালবৃত্তি করে। শচীন দাশের অন্যান্য গল্পের মত এই গল্পেও ছিটমহলের অবস্থানগত দিকটি নিয়ে আমাদের সংশয় হয়। গল্পে লেখক ন্যাড়াপোতা নামে যে ছিটমহলটির উল্লেখ করেন, বোঝা যায় তা কাল্পনিক। পার্শ্ববর্তী হাসপাতালের নাম কুচলিবাড়ি হওয়ায় আমরা পাঠকেরা অনুধাবন করতেই পারি কথাকার আসলে দহগ্রাম এবং অঙ্গারপোতা ছিটের ছবিকে মাথায় রেখে গল্পের আখ্যান পটটি নির্মাণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে বলার আছে যে, ১৯৯২ সালে তিনবিঘা করিডর নির্মাণের মধ্য দিয়ে অঙ্গারপোতা এবং দহগ্রামকে মূল বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। যদি এই দুই ছিটকে মাথায় রেখে আখ্যানকার গল্পটি নির্মাণ করে থাকেন, তবে গল্পটিকে আমাদের ১৯৯২ সালের পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে পাঠ করতে হবে। তবে গল্পটিতে ছিটবাসীদের যে সংকটকে কথাকার উত্থাপন করেছেন, যে প্রতিবাদের স্বরকে তিনি উচ্চারণ করেছেন, তা ভারত-বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অবস্থিত সকল ছিটমহলেরই সামগ্রিক সংকট, তা সকল

ছিটবাসীদেরই সার্বিক উচ্চারণ।

‘ছিটমহলের ভূমি’গল্পটি ২০১৫ সালের আগস্ট-অক্টোবর মাসে পরিচয় (শারদ সংখ্যা, ১৪২২) পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও ২০১৬ সালে পুনরায় ‘যূথিকা বুক স্টল’ থেকে প্রকাশিত লেখকের পঁচিশটি গল্প গ্রন্থে সংকলিত হয়। ২০১৮-য় অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল সম্পাদিত ছিটমহলের গল্প সংকলনে গল্পটি পুনরায় সংকলিত হয়। অমর মিত্রের লেখা ‘অনাগরিক’ কিংবা ‘কাশেমের ঘাট’ গল্পের মত এই গল্পটিও ২০১৫ সালের ৬ জুলাই থেকে ১৬ জুলাইয়ের মধ্যবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। আবার ‘ছিটমানুষ’ গল্পের পাশাপাশি রেখে এই গল্পটিকে পাঠ করলে বোঝা যায় কথাকার পূর্ববর্তী কাহিনির ঘটনাক্রমকে বজায় রেখেই যেন এই গল্পটি লিখেছেন। যদিও গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের নামগুলি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। বৃদ্ধ আবু তাহের এখানে খালেক মিঞা এবং তার পুত্র জসীম এখানে মনসুর-এ পরিণত হয়েছে।

আখ্যানকার এই গল্পে কোচবিহার কিংবা রংপুরের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্য না দিলেও, প্রসঙ্গত ছিটমহল সৃষ্টির ইতিবৃত্তটিকে সংক্ষেপে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। সমগ্র গল্প জুড়ে ছিটমহল আন্দোলন এবং সমন্বয় সমিতির প্রসঙ্গও ঘুরে ফিরে এসেছে। গল্পের নিঃসঙ্গ জীবনযাপনকারী নায়ক বৃদ্ধ খালেক মিঞাও এই আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিল। কিন্তু বয়সের ভারে ক্লান্ত বুড়ো যখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্বাধীনতা পেতে চলেছে, তখন নানান স্মৃতি, নানান প্রশ্ন, নানান দ্বন্দ্ব তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। আনন্দ-বিষাদের মিশ্রিত অনুভব এই পুনর্জন্মের প্রাক্কালে খালেককে যেন উন্মাদ করে তোলে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় বিনিময় কমিটির সদস্যেরা তার কাছে যেন ফিরে ফিরে আসছে। আমরা পাঠকেরা অনুধাবন করি খালেকের অবচেতনে সুপ্ত আত্মপরিচয়ের খোঁজ কীভাবে হ্যালুসিনেশন্ হয়ে ধরা দিয়েছে। ছিটমহল তার পুত্রকে গ্রাস করেছে। পুত্র মনসুর মিথ্যে পরিচয়ে ভারতভূখণ্ডে আশ্রয় নিলেও, আর ফিরে আসেনি বৃদ্ধ পিতার কাছে। তাই খালেক মিঞা স্থির করে সরকারি কর্মীরা অপশন নিতে এলে পুত্রের নাম আর উচ্চারণ করবেনা। বাস্তবের ছিটমহলও কত সম্পর্ককে ধ্বংস করেছে তার কোনও হিসেব নেই। শুধু পিতা-পুত্রই নয়, ভাই-বোন, মা-সন্তান এমনকি অসংখ্য দাম্পত্য সম্পর্কও চিরতরে হারিয়ে গেছে দেশহীনতার কারণে। বিনিময় পরবর্তীকালেও অনেকগুলি পরিবার তাদের নিকটাত্মীয়-পরিজন পরিত্যাগ করে ভারত ভূখণ্ডে এসে আশ্রয় নেয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ভারতীয় ছিট বাঁশকাটার বাসিন্দা স্বপ্না বর্মণের কথা মনে আসে। ছিট বিনিময়

কালে স্বপ্না এপারে চলে এলেও তাঁর বৃদ্ধ স্বামী প্রশাসনিক কারণে এদেশে আসতে পারেননি। সরকারি প্রতিশ্রুতি সত্বেও তিন বৎসর অতিক্রান্ত হলেও অসুস্থ স্বামীকে ফিরে পাননি স্বপ্না তিনি। গল্পের খালেকেরও কিন্তু তার পুত্রকে আর ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় না।

গল্পের পটভূমিতে যে সাজিরহাট নামক ছিটের উল্লেখ করা হয়েছে, বাস্তবে এ জাতীয় কোনও ছিটের অস্তিত্ব না থাকলেও, পাট গ্রামের উল্লেখে আমরা বুঝতে পারি লেখক আসলে বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় কোনও ছিটের ছবিকে অঙ্কন করতে চেয়েছেন। বাস্তবে পাট গ্রাম বাংলাদেশের একটি উপজেলা এবং ভারতীয় ছিটের অনেকটা অংশ এই পাট গ্রামেই অবস্থান করেছে। ৬-১৬ জুলাই ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা সেখানে যে সমীক্ষা কার্য সম্পাদন করেন, তাতে ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির লোকেরাও তাদের সহায়তা করেন। আখ্যানকার গল্পের সমাপ্তিতে এইরকম সমীক্ষারই একটি চিত্রকে তুলে ধরেছেন। খালেকের হ্যালুসিনেশনে বার বার বিনিময় সমিতির লোকেরা এসে ধরা দিলেও, বাস্তবে সরকারি প্রতিনিধি সহ বিনিময় সমিতির সদস্যরা যখন খালেক মিঞার মুখোমুখি হয়, তখন খালেক মিঞার দেহে আর প্রাণ থাকে না। দেশের স্বপ্নে আজীবন লড়াই করে চলা এই মানুষটির শেষ অবধি আর দেশ পাওয়া হয় না, ছিটের মাটিতেই তার স্বপ্ন মিশে যায় চির ঘুমের অন্ধকারে। গল্পকার এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কী ইঙ্গিত করেছেন তাকে আমরা নিখুঁতভাবে স্পর্শ করতে না পারলেও, কখনো আমাদের মনে হয় তিনি যেন বোঝাতে চেয়েছেন – যে দেশের স্বপ্নে ছিটবাসীরা এতদিন লড়াই করে এলেন, বাস্তবে সে দেশ তারা লাভ করলেও, নাগরিকত্বের বাইরেও আরও যে সকল জটিলতা তাঁদের ঘিরে রেখেছে, সেই সংকট গুলি থেকে তারা মুক্ত হতে পারবেন তো! নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাদের মনে সুপ্ত সেই প্রত্যাশাগুলির অচিরেই মৃত্যু ঘটবে না তো! অন্তত বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা নব্যভারতীয়দের সাপেক্ষে এ সন্দেহ হওয়াটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। পোয়াতুর কুঠি ছিটের শতোর্দ্ধ আজগর আলি আজ মৃত্যুবরণ করলেও, জীবনে অন্তত একবার ভোটটুকু দেবার অধিকার পেয়েছিলেন, কিন্তু ওদেশে আটকে থাকা স্বপ্না বর্মণের পরিচয়পত্রহীন বৃদ্ধ স্বামী কি পারবেন শেষ অবধি রাষ্ট্রের বুকে ফিরে আসতে! গল্পের খালেক মিঞার মত তাকেও অপ্রাপ্তির যন্ত্রণায় বাকি জীবনটুকু হারাতে হবে না তো!

সমগ্র বিশ্বেই শুধু নয়, একটি দেশের মধ্যে, এমনকি একটি রাজ্যের মধ্যেও অঞ্চলভেদে সীমান্ত চরিত্র বদলে যেতে থাকে। আমরা পাঞ্জাবে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান

সীমান্তকে যেভাবে দেখি, যে সীমান্ত সংস্কৃতির প্রতিবেশকে আমরা লক্ষ করি, পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ সীমান্তকে সেই দৃষ্টিতে দেখতে পারি না, একই রকম সীমান্ত সংস্কৃতিও সেখানে পরিচালিত হয় না। আবার পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ, হিলি কিংবা সুন্দরবনের সীমান্তের সাথেও তিনবিঘা করিডোর, সিতাই, মেখলিগঞ্জ, দিনহাটা কিংবা তুফানগঞ্জ এলাকার সীমান্ত সংস্কৃতিকেও মেলানো সম্ভব নয়। সীমান্ত চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় পারিপার্শ্বিকতাও। সীমান্ত কেন্দ্রিক সমস্যা হলেও ছিটমহল সমস্যায় সীমান্ত একটি অংশমাত্র। এর বাইরেও যে অজস্র সমস্যা ছিটমহলকে ঘিরে আবর্তিত হয়, তাকে অনুধাবন করতে হলে আঞ্চলিকতার অবলম্বন ছাড়া আমাদের নিস্তার নেই। জটিল ভূমিগত অবস্থানের উৎসকে বুঝতে হলে ইতিহাস যেমন সহায়, এর বর্তমান চালচিত্রকে স্পর্শ করতে হলেও তেমনি ছিটবাসীদের সহাবস্থান অত্যন্ত জরুরি, না হলে নো ম্যান্স ল্যান্ডকেও ছিটমহল বলে ভুল হতে পারে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. দাশ, শচীন, ‘ছিট মানুষের বেত্তান্ত’ (গল্প), অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ), *গল্পগুচ্ছ*, কলকাতা, শারদ সংখ্যা ১৪২০, পৃ. ৮৮

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৪. ‘নিউজ টাইম’-এর উদ্যোগে নির্মিত ‘ব্রাত্যজনের দেশে’ নামক ছিটমহল বিষয়ক তথ্যচিত্রে কোচবিহার ‘রেডক্রস’-এর সদস্য স্বপন আচার্য ভাদুড়ির দেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত বক্তব্য অনুসারে।

৫. দাশ, শচীন, ‘ছিট মানুষের বেত্তান্ত’ (গল্প), অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ), *গল্পগুচ্ছ*, কলকাতা,শারদ সংখ্যা ১৪২০, পৃ. ৯০

৬. দাশ, শচীন, ‘ছিট মানুষ’ (গল্প), বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (সম্পাঃ) *পরিচয়*, শারদ সংখ্যা ১৪২০, পৃ. ২৪৮

৭. ‘নিউজ টাইম’-এর উদ্যোগে নির্মিত ‘ব্রাত্যজনের দেশে’ নামক ছিটমহল বিষয়ক তথ্যচিত্রে ছিটবাসী কেবলা মিঞার বক্তব্য থেকে প্রাপ্ত।

৮. দাশ, শচীন, ‘ছিট মানুষ’ (গল্প), বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (সম্পাঃ) *পরিচয়*, শারদ সংখ্যা ১৪২০, পৃ. ২৪৮

৯. পূর্বোক্ত

১০. ৩ আগস্ট ২০১৫-য় *এই সময়* –এ প্রকাশিত ‘পিতৃ পরিচয় ভুলে থাকতে কারই বা ভালো

লাগে?' শীর্ষক প্রতিবেদনে প্লাবন চক্রবর্তীর লিখিত বক্তব্য অনুসারে।

১১. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্র, *রাজনীতির অভিধান*, আনন্দ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১২

১২. দাশ, শচীন, 'ছিটপাখি (গল্প), অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী (সম্পাঃ) *নন্দন*, কলকাতা,শারদ সংখ্যা ১৪২০, পৃ. ৩৩৫

১৩. পূর্বোক্ত